

তৈল
-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

তৈল যে কি পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবির কতক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ। বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠান্ডা করে, তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে?

সংস্কৃত কবির ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপে স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান; যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিমান তৈল ব্যবহার করিতে জানে, সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা। তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না — উকীলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না, বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না। যে তৈল দিতে পারিবে, তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে। আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িম্যার গভর্নর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ। তৈল নহিলে জগতের কোন কাজ সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহেরা খোলে না, হাজার গুন থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, তৈল থাকিলে তাহার কিছুই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিমান তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম প্রণয়; যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম মৈত্রী; যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য “ফিলনথপি।” যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি; যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম নম্রতা বা মডেস্টি। চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়। অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এইজন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয় ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত, তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতাপুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে রাজায়-প্রজায় বিবাগ বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে, যে তৈল দিতে পারে, সে সর্বশক্তিমান, কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান। কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাটসাহেব পর্যন্ত তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিষ নয় যে, নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ

আদায় করিতে হইবে, সেই তৈলনিষেধের প্রধান পাত্র। সময় — যে সময়েই হউক, তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল — পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়েছে, যেকোনো হউক, তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না, তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না, একজন ইংরেজিওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া এক বিন্দু দিলে যত কাজ হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতরতাম্য অনেক আছে। নিষ্কৃতিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে, তাহাতে যে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার তৈল আমার তৈল হইতে মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে, তাহার আরও মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে, তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামত আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর, বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাকটিক্যাল অর্থাৎ কাজের লোকের হইতে পারে; তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার। অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, বাচ্ছিয়া বাচ্ছিয়া কোন রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহ-নিষেধের কালেজ খোলা হয়। অন্ততঃ উকীলি শিক্ষার নিমিত্ত ল' কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যিক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন — কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে, আমি দেই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার। এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেকচার পাওয়া যায় না। যদিও কোন রীতিমত কালেজ নাই, তথাপি যাঁহার নিকট চাকরীর বা প্রমোশনের সুপারিস মিলে, তাদৃশ লোকের বাড়ী সদাসর্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালীর একমাত্র ভরসা তৈল — বাঙালীর যে কেহ কিছু করিয়াছেন, সকলই তৈলের জোরে, বাঙালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়; এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্পলোক জানেন। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে, ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে হওয়া হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া

আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের খুঁ হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।
শেষে মনে রাখা উচিত ,এক তৈলে চাকাও ঘোরে আর তৈলে মনও ফেরে।

নয়নচারা ॥ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটাসত্তি ময়ূরাক্ষী-রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালোস্রোত কল-কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলে ডিঙ্গিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বসহা আশার মতো মৃদু মৃদু জ্বলে।

তবে ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে: ময়ূরাক্ষী! কোথায় ময়ূরাক্ষী? এখানে তো কেমন ঝাপসা গরম হাওয়া। যে হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে? ফুটপাতে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেয়েছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে-মৃত্যুর মতো নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম। তবে আমুর চোখে ঘুম নেই, শুধু কখনো-কখনো কুয়াশা নামে তন্দ্রার এবং যদিবা ঘুম এসে থাকে, সে-ঘুম মনে নয়-দেহে; মন তার জেগে রয়েছে চেনা নদীর ধারে, কখনো কলপনায় কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসে, এবং শুনছে তার অবিশ্রান্ত মৃদু কলস্বন, আর দূরে জেলে ডিঙ্গিগুলোর পানে চেয়ে ভাসছে। ভাবছে যে এরই মধ্যে হয়তোবা ডিঙ্গির খোদল ভরে উঠেছে বড় বড় চকচকে মাছে- যে চকচকে মাছ আগামীকাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারী করে তুলবে জেলেদের ট্যাঁক। আর হয় তো বা, কী হয় তো বা?

কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। থক্ক থক্ক থ-থ-থ। একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, কেবল কাশে আর কাশে, শুনে মনে হয় দম বন্ধ না হলে ও কাশি আর থামছে না তবু থামে আশ্চর্যভাবে, তারপর সে হাঁপায়, কাশে কখনোবা কাশে না বটে তবে তার গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ হয় একটানা যেন ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় শব্দতুলে সে কোথায় চলেছে যে চলেছেই। তাছাড়া সব শব্দ, নীরবতা পাখা গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে আর জমাট বন্ধ ঘনায়মান কালো রাত্রি পর্বতের মতো দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লভ্য।

ভুতনিটা এবার জোর আওয়াজে কেশে উঠলো বলে আমুর মনে কুয়াশা। সে ভরা চোখে তাকালো ওপরের পানে-তারার পানে এবং আকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবলো, এই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতো? কিন্তু সে তারাগুলোর নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য আর ময়ূরাক্ষী। আর এ তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ, নির্ভরতা, অসহ্য বৈরিতা।

কিন্তু তবু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কি যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে। কিন্তু যা এসেছিল, মুহূর্তে তা শূন্য রিক্ত করে দিয়ে গেলো। কিছু নেই। শুধু ঘুম নেই। কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে। নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার। সে ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে, বহুদূরে- কোথায় গো? যেখানে শান্তি-সেইখানে? কিন্তু সেই শান্তি কি বিস্তৃত বালুচরের শান্তি?

তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। আর এখানে শহর। মন্ত্রগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসছে গলি দিয়ে, এবং নদীর মতো প্রশস্ত এ রাস্তায় সে যখন এলো তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখলো যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে-চোখ হীনতার ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। হয়তোবা সেটা শয়তানের চোখ নয়, হয় তো শুধুমাত্র একটা বিড়ি। তাহলে অদৃশ্যপ্রায় কালো শয়তানের হাতে বিড়ি, যেটা দুলছে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায় ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন জ্বলে ওঠে। তবে শুধু এই বিস্ময়-ই; ভয় করে না একটু-ওঃ বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করবার জন্য অপেক্ষমান। তাছাড়া রাস্তার অপর পাশের বাড়িটার একটা বন্ধ জানালা থেকে যে উজ্জ্বল ও সরু একটা আলো রেখা দীর্ঘ হয়ে রয়েছে, সে, আলো রেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা, তখন শয়তানের হাতে আগুন জ্বলতে দেখলে আরো ক্রোধ হয় মানুষের। আগুনটা দুলছে নাতো যেন হাসছে; আমুরা

যখন ক্ষুধার যন্ত্রনায় কঁকায়-তখন পথ চলতি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ারকোন অজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসছে। কিন্তু কেন হাসবে? দীর্ঘ উজ্জ্বল সে রেখাকে তার ভয় নেই? জানে না সে যে ওটা খোদার দৃষ্টি-অকম্পিত দ্বিধাশূন্য ঋজু দৃষ্টি? তবু আলো-কণা হাসে, হাসে কেবল, পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক, আলাদা দুনিয়ায় হাসুক, কারো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ-দুনিয়ায়-যে-দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে ধারে পড়ে রয়েছে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, যে দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না-দেবে না।

তবু কালো শয়তান রহস্যময়ভাবে এগিয়ে আসছে। শূন্যে ভাসতে ভাসতে যে এগিয়ে আসছে ক্রমশ এসে কী আশ্চর্য, আলো রেখাটাও পেরিয়ে গেল নির্ভয়ে এবং গতিরুদ্ধ দীর্ঘ সে রেখা বাধা দিলো না তাকে। মৃতগতির পানে চেয়ে নদীর বুকে তারপর নামলো কুয়াশা আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নামলো। পরায় মেনে নেয়াতে-ও যেন শান্তি।

রোদদন্ধ দিন খরখর করে। আশ্চর্য কিন্তু একটা কথা: শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশের কুকুরের চোখে বৈরিতা। তবুও ভালো।

ময়রার দোকানে মাছি বোঁ বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কোমলতা, সে চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ ধকধক করে জ্বলছে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাড়ি কলা ঝুলছে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয় তো, যেন হলুদ রঙা স্বপ্ন ঝুলছে। ঝুলছে দেখে ভয় করে-নীচে কাঁদায় ছিঁড়ে পড়বে কি হঠাৎ? তবু শঙ্কা ছাপিয়ে আমুর মন উর্ধ্বপানে মুখ করে কেদে ওঠে, কোথায় গো, কোথায় গো নয়নচারী গাঁ?

লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে; রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিয়ার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিল রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নিচেটা সাদা, এত সাদা যে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বার জন্য খাঁ খাঁ করে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেল রক্ত ঝলকিয়ে। কিন্তু একটা কথা: ও কী জানে না-আসলে ও চুল কার। ও-চুল নয়নচারী গাঁয়ের মেয়ে বিয়ার মাথার ঘন কালো চুল।

কিন্তু পথে কতো কালো গো। অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অগুনতি মাথা; কোন সে অগুনত হাওয়ায় দোলায়িত এ-কালো রঙের সাগর। এমন সে দেখেছে শুধু ধানক্ষেতে, হাওয়ায় দোলানো ধানের ক্ষেতের সাথে এর তুলনা করা চলে। তবু তাতে আর এতে কত তফাৎ। মাথা কালো, জমি কালো, মন কালো। আর আর দেহের সাথে জমির কোন যোগাযোগ নেই, যে হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্পমান, সে হাওয়ায় দিগন্ত থেকে উঠে আসা সবুজ শস্য কাঁপানো সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ হাওয়া নয়: এ-হাওয়া সে চেনে না।

অসহ্য রোদ, গাছ নেই। ছায়া নেই নিচে, কোমল ঘাস নেই। এটা কি রকম কথা: ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে অথচ ছায়া নেই ঘাস নেই। আরও বিরক্তিকর- এ কথা যে কাউকে বলবে, এমন কোনো লোক নেই। এখানে ইটের দেশে তো কেউ নেই-ই, তার দেশের যারা বা আছে তারাও মন হারিয়েছে, শুধু গোঙানো পেট তাদের হা করে রয়েছে অন্ধ চোখ চেয়ে।

তবু যাক, ভুতনি আসছে দেখা গেলো। কিরে ভুতনি? ভুতনি উত্তর দিলো না, তার চোখ শুধু ড্যাব ড্যাব করছে, আর গরম হাওয়াটায় জটা পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিরে ভুতনি? ভুতনি এবার নাক ওপরের দিকে তুলে কম্পান জিহ্বা দেখিয়ে হঠাৎ কেদে ফেললে ভাঁ করে। কেউ দিলো না বুদ্ধি, পেট বুদ্ধি ছিড়ে যাচ্ছে? কিন্তু একটা মজা হয়েছে কি জানিস, কোথেকে একটা মেয়ে রক্ত ছিটাতে ছিটাতে এসে আমাদের দুটো পয়সা দিয়ে চলে গেল, তার মাথায় আমাদের সেই বিয়ার মাথার চুল-তেমনি ঘন, তেমনি কালো। আর তার গলায় নিচেটা-। ভুতনির গলার তলে ময়লা শুকনো কাদার মতো লেগে রয়েছে। থাক সে কথা। কিন্তু তুই কাঁদছিস ভুতনি, ওরে ভুতনি?

কী একটা বলে ফেলে ভুতনি চোখ মুখ লাল করে কাশতে শুরু করলো। তার ভাই ভুতো মারা গেছে। কোন

নতুন কথা নয়, পুরনো কথা আবার নতুন করে বলা হলো। সে মরেছে; ও মরেছে; কে মরেছে বা কে মরছে সেটা কোন প্রশ্ন নয়, আর মরছে মরছে কথা দু-রঙা দানায় গাঁথা মালা, অথবা রাস্তার দুধারের সারি-সারি বাড়ি-যে বাড়িগুলো অদ্ভুতভাবে অচেনা অপরিচিত, মনে হয় নেই অথচ কেমন আলগোছ অবশ্য রয়েছে। ভুতুনির কান্না কাশির মধ্যে হারিয়ে গেলো। কাশি থামলে ভুতুনি হঠাৎ বলে, পয়সা? তার পয়সার কথাই যেন শুধোচ্ছে। হ্যাঁ, দুটো পয়সা আমুর কাছে আছে বটে কিন্তু আমু তা দেবে কেন? ভুতুনির চোখ কান্নায় প্যাক-প্যাক করছে, আর কিছু কিছু জ্বলছে। কিন্তু আমু কেন দেবে? ভুতুনি আরো কাঁদলো, আগের চেয়ে এবার আরো তীব্রভাবে। তাই দেখে জ্বলে উঠলো। চোখ যখন জ্বলে উঠলো তখন দেহ জ্বলতে আর কতক্ষণ: একটা বিদ্রোহ-একটা ক্ষুরধার অভিমান ধাঁধাঁ করে জ্বলে উঠলো সারাদেহময়। তাতে তবু মন যেন প্রতিহিংসার উজ্জ্বল উপসম।

সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। বহু অচেনা পথে ঘুরে ঘুরে আমু জানালো যে ও-পথগুলো পরের জন্য, তার জন্য নয়। রূপকথার দানবের মতো শহরের মানুষরা সায়ন্তন গরাভিমুখ-চাঞ্চল্যে খরখর করে কাঁপছে। কোন এক গুহায় ফিরে যাবার জন্য তাদের এ-উগ্র ব্যস্ততা? সে গুহা কি ক্ষুধার? এবং সে গুহায় কি স্তপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংশের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তপ? কত বৃহৎ সে গুহা?

অচেনা আকাশের তলে অচেনা সন্ধ্যায় আমুর অন্তরে একটা অচেনা মন ধীরে ধীরে কথা কয়ে উঠেছে। ক্ষীণ তার আওয়াজ, তবু মনে হয় গুহার পানে প্রবাহিত এ বিপুল জলস্রোতকে ছাপিয়ে উঠেছে তা। কী কইছে সে? অস্পষ্ট তার কথা অথচ সে অস্পষ্টতা অতি উগ্র: মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আর্তনাদ। কী? এই সন্ধ্যা না হয় অচেনা সন্ধ্যা হলো: রূপকথার সন্ধ্যাও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ-সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কন্টাকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ? কে তুমি, তুমি কে? জানো সারাআকাশ আমি বিষাক্ত রুদ্ধ জিহ্বা দিয়ে চাটবো। চেটে-চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাবো সে আকাশ দিয়ে-কে তুমি, তুমি কে?

আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মতো। সে ক্ষমা চায়; শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করছে, এবং তাই সে ক্ষমা চায়: দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। চারধারে তো রাত্রীর ঘন অন্ধকার, শক্তিশালীর ক্ষমা করার কথা জানবে না কেউ।

ওধারে কুকুরে কুকুরে কামড়াকামড়ি লেগেছে। মনের এ পবিত্র সান্ত্বনায় সে কোলাহলের তীর আওয়াজ অসহনীয় মনে হলো বলে হঠাৎ আমু দূর দূর বলে চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর জানালো যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়! অথবা ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়।

কিন্তু আমু মানুষ, ভেতরে বাইরে মানুষ। সে মাপ চায়। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠে পড়লো, তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিসের সন্ধান যেন তাকালো রাস্তার ক্ষীণ আলো এবং দুপাশের স্বল্পালোকিত জানালাগুলোর পানে।

দোতলা তেতলা-আরো উঁচুতে স্বল্পালোকিত জানালা ধরা-ছোয়ার বাইরে। তুমি কি ওখানে থাক?

তারপর কখন মাথায় ধোঁয়া উড়তে লাগলো। এবং কথাগুলো মাথায় ধোঁয়া হয়ে উড়ছে। উদরের অসহ্য তাপে জমাট কথাগুলো ধোঁয়া হয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর গলাটা যেন সুড়ঙ্গ। আমু শনতে পারছে বেশ যে কেমন একটি অতি ক্ষীণ আওয়াজ সে-গভীর ও ফাঁকা সুড়ঙ্গ বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে আসছে ওপরের পানে এবং অবশেষে বাইরে যখন মুক্তি পেলো তখন তার আঘাতে অন্ধকারে কেউ জাগলো চেউগুলো দু-ধারের খোলা চোখ-ঘুমন্ত বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো তার কানে। মাগো চাট্রি খেতে দাও।

এই পথ, ওই পথ: এখানে পথের শেষ নেই। এখানে ঘরে পৌঁছানো যায় না। ঘর দেখা গেলেও কিছুতেই

পৌঁছানো যাবে না সেখানে। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, কারা খেতে আসে, কারা খায়, আর পয়সা বনবান করে: কিন্তু এধারে কাঁচ। কাঁচের এপাশে মাছি আর পথ আমু। তবু দাড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভেতর থেকে কে একটিলোক বাজের মত খাঁইখাঁই করে তেড়ে এলো। আরে লোকটি অন্ধ নাকি? মনে মনে আমু হঠাৎ

হাসলো একচোট, অন্ধ না হলে এমন করবে কেন? দেখতে পেত না যে সে মানুষ?

পথে নেমে আমু ভাবলে, একবার সে শুনেছিলো শহরের লোকরা অন্ধ হলে নাকি শোভার জন্য নকল চোখ পড়ে। দোকানের লোকটি অন্ধই আর তার চোখে সে-নকল চোখ। কিন্তু একটা আওয়াজ শুনে হয়তো ভেবেছে বাইরে কুকুর, তাই তেড়ে উঠেছিলো অমন করে। কিন্তু সে কথা যাক, আশ্চর্য হতে হয় কান্ড দেখে। নকল চোখে আর আসল চোখে তফাৎ নেই কিছু।

তারপর মাথায় আবার ধোঁয়া উড়তে লাগলো। ময়ুরাক্ষীর তীরে কুয়াসা নেমেছে। স্তব্ধ দুপুর: শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকায় খরতালে ঝনঝন করছে আর এধারে শ্মাশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে পেরিয়ে এসেছে, আর অনিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে। কড়া একটা গন্ধ নাকে লাগছে। কী কোলাহল, লোকেরা আসছে, যাচ্ছে। হোটেল। দাঁড়াবে কি এখানে? দাড়ালে দাড়াতে পারে, তবে নকল চোখ পরা কোন অন্ধ তো নেই এখানে, আওয়াজ পেয়ে তেড়ে আসবে না খাঁইখাঁই করে? কিন্তু গন্ধটা চমৎকার। তারপর বোশেখ মাসের শূন্য আকাশ হঠাৎ যেমন মেঘে ছেয়ে যায়, তেমনি দেখতে না দেখতে একটা ভীষণ কালো ক্রোধে তার ভিতরটা করাল হয়ে উঠলো, আর কাঁপতে থাকলো সে খরখর করে: সিঁড়ির ধারে একটা প্রতিবাদী ভঙ্গিতে সে রইলো দাঁড়িয়ে। অবশেষে ভেতর থেকে কে চৈঁচিয়ে উঠলো, আরেকজন দ্রুতপায়ে এলো এগিয়ে, এসে হীনভাষায় কর্কশ গলায় তাকে গালাগালি দিয়ে উঠলো। এই জনোই আমু প্রস্তুত হয়ে ছিলো। হঠাৎ সে স্ফিগের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর, এবং তারপর চকিতে ঘটিত বহু ঝড় ঝাপটার পর দেহে অসহ্য বেদনা নিয়ে আবার যখন সে পথ ধরলো, তখন হঠাৎ কেমন হয়ে একবার ভাবলে: যে-লোকটা তাড়া করে এসেছিলো সে-ও যদি ময়ূরার দোকানের লোকটার মতো অন্ধ হয়ে থাকে? হয়তো সে-ও অন্ধ, তার-ও চোখ নকল। শহরে এত-এত লোক কি অন্ধ? বিচিত্র জায়গা এই শহর!

চাকল্যকর ঘটনার পর উত্তেজিত মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় নিলো এবং সে উত্তেজনার মধ্যে কোন রাস্তা হতে কোন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে হঠাৎ একসময়ে সে থমকে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে ভাবলো: যে পথের শেষ নেই, সে পথে চলে লাভ নেই, বরঞ্চ ওই যে ওখানে কে কঁকাছে সেখানে গিয়ে দেখা যাক কী হয়েছে তার। ফুটপাথের ধারে গ্যাসপোস্ট, তার তলে আবছা অন্ধকারে কে একটা লোক শুয়ে রয়েছে, আর পেটে হাত চেপে দূরন্ত বেদনায় গোঙাচ্ছে। তার একটু তফাতে যে কয়টা লোক উবু হয়ে বসে রয়েছে তাদের মুখে কোন সাড়া নেই, শুধু তারা নিঃশব্দে ধুঁকছে। আমু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর আপন মনে থমকে ভাবলো, ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। সে কেন যাবে তাদের কাছে, যাবে না। তারপর কেমন একটা চাপা ভয়ে সে যেন ভাঙা পা নিয়ে পালিয়ে চললো। কী যে সে ভয় সে কথা সে স্পষ্ট বলতে পারবে না এবং সে কথা জানবারও কোন তাগিদ নেই শুধু যেন কেমন একটা ভয় হতে মুক্তি পাবার জন্যে সে পালিয়ে যাবে সে-রাস্তা দিয়েই, যে রাস্তার কোনো শেষ নেই। যে ছায়া ঘনিয়েছে মনে, তারও কী শেষ নেই? আর সে ছায়া কী মৃত্যুর?

অনেকক্ষণ পর তার খেয়াল হলো যে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আর তার গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে-বেয়ে উঠছে ওপরের পানে এবং যখন সে আর্তনাদ শুন্যতায় মুক্তি পেলো, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেলো, অত্যন্ত বিভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনালো তা। এ কি তার গলা-তার আর্তনাদ? সে কি উন্মাদ হয়ে উঠেছে? অথবা কোনো দানব কি ঘর নিয়েছে তার মধ্যে? তবু তবু তার মনের প্রবল উপেক্ষা করে সুড়ঙ্গের মতো গলা বেয়ে তাক্ষ, তীর, বিভৎস আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগলো, আর সে খরখর করে কাঁপতে লাগলো আপাদমস্তক। অবশেষে দরজার প্রাণ কাঁপলো, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, এসে অতি আস্তে আস্তে অতি শান্ত গলায় শুধু বললে: নাও।

কী? কী সে নেবে? ভাত নেবে। ভাতই কি সে চায়? সে ভাতই চায়: এ দুনিয়ায় চাইবার হয়তো আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাদের নাম সে জানে না। ব্রহ্মভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে,

নিখে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিঃসলক চেয়ে রইলো মেয়েটির পানে। মনে হঐছে যেন চেনা-চেনা। না হলে সে
চোখ ফেরাতে পারবে না কেন!
নয়নচারী গ্রামে কি মায়ের বাড়ি?
মেয়েটি কোনো উত্তর দিলে না। শুধু ংকটু বিস্ময় নিয়ে কয়েকমুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে
দিলো।

বাঙ্গালা ভাষা

বাঙ্গালা ভাষা*

লিখিবার ভাষা

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী কক্‌নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুকু বা না বুকু, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য# গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গলায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতাহেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় “আলালের ঘরের দুলাল” প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ।

পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত—এখনও হইতেছে। বোধ হয়, আজি কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ

করিতেছে : চণ্ডীদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য, অথবা কৃতিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্তসংহার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা কেবল বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধেই বৰ্তে। যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সম্ভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্যকরী। অতএব পদ্যের রীতি ভিন্ন হইলেও, এই প্রবন্ধের প্রয়োজন কমিল না।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা স্বাভাৱন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা, তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য। মদ্য, মুরগী, এবং টেকচাঁদী বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এফণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা—তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এফণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্কুল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না—পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন। * আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি “আলালের ঘরের দুলাল” হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, “এফণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচ জন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয়, এবং উহা সর্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ

হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও, উহা সর্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফুলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাড়া মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যিক।”

*যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যাবত্তা দেখান, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি একছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই, তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন; যিনি এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলস্থূল বাঁধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই—তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্যন করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল।

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতা পুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, “হে মাতঃ, খাদ্যং দেহি মে” এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, “ছিল্লৈয়ং পাদুকা মদীয়া”। ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এি যে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ আমাদের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে

সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি ‘জনৈক’ লিখিতে দিবেন না। স্ব প্রত্যয়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা—একাদশ বা চত্বারিংশ বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কন্যা, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কান, সোণা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণবাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা—গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা—জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা—মাথার পরিবর্তে, মস্তক, বামনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এফ্রণে বামনও যেমন প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যে রূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। ভাই যে রূপ প্রচলিত, ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষ আছে যে, ধান্য পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বর্ধাই? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্য করা ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের বৈলক্ষণ্য ঘটয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে “খেউরি”, কিন্তু ফৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই “খেউরি” শব্দ। এ স্থলে ফৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে—তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে। যদিও আমরা এমন বলি না যে, “ঘর” প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথার শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তাম্রের পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তাম্র বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা

যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। “হে ভ্রাতঃ” বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে, “ভাই রে” বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। “ভ্রাতৃত্ব” এবং “ভাইত্ব”, “ভ্রাতৃষ্ণ” এবং “ভাইগিরি” এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ আনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান ইংরেজের অর্থভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফার্সি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ।

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভুরি ভুরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে শব্দ কর্জ করিতে হইবে। কর্জ করিতে হইলে, চিরকালে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য।

প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? “মাধ্যাকর্ষণ” বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে।

“গ্র্যাভিটেশন্” বলিলে ইংরেজি যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্ব্যচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক গ্রাহি গ্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্য কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দপণ্ডিতে বুকুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দূরহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে

পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাশও বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূর রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব এত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সৰ্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দূরহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হতোমিপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদি ভাষা, হতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্ফূট, কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণসাত্ত্বিকা কবিতায় স্ফূট ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুৰ্বল এবং অপরিমার্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহা আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্টরীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

সেই দিন এই মাঠ

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—

এই নদী নক্ষত্রের তলে

সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—

সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর কবে!

আমি চ'লে যাব ব'লে

চালতামূল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে

নরম গন্ধের ঢেউয়ে ?

লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে ?

সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর কবে !

চারিদিকে শান্ত বাতি— ভিজে গন্ধ— মৃদু কলরব ;

খেয়ানোকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;

পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল ;—

এশিরিয়া ধুলো আজ— বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

তোমরা যেখানে সাধ

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও— আমি এই বাংলার পারে

র'য়ে যাব ; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে ;

দেখিব খয়েরি ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে

ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে

নেচে চলে— একবার— দুইবার— তারপর হঠাৎ তাহারে

বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে ;

দেখিব মেয়েলি হাত সঙ্কল্প— শাদা শীখা ধূসর বাতাসে

শঙ্খের মতো কীদে : সন্ধ্যায় দীড়াল সে পুকুরের ধারে,

খইরজা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনীর দেশে—

'পরশ-কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,

চ'লে যায় কুয়াশায়,— তারপর দূরে নিকরদেশে
হারায় না ভাবে আমি— সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে।

বাংলার মুখ আমি

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের সুপ
জাম— বট— কাঁঠালের— হিজলের— অশথের ক'রে আছে চূপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে !
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল— বট— তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল : বেহুলাও একদিন গাঙড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেনি— একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খজনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

যতদিন বেঁচে আছি

যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া